WBMDFC

KNOWLEDGE SERIES III

তিতুমির

স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রথম শহীদ ও কৃষক আন্দোলনের মহানায়ক

মুখবন্ধ

সমাজ ইতিহাসের ধারায় দেখা গেছে কিছু কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়-এর দ্বারা অনন্য হয়ে ওঠেন। সততা, মুক্ত চিন্তা ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাদের ব্যক্তিত্ব নিজ প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ। 'পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম' বিগত দিনের বাংলার কয়েকজন মনীষীর জীবন ও কর্মসাধনার বিবরণ (WBMDFC-Knowledge Series) একটি স্বল্প দৈর্ঘের তথ্যচিত্র ও পুস্তিকার মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। এদের কর্মসাধনা ও জীবনব্রত পাঠে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অবশ্যই অনুপ্রাণিত হবে বলে আমাদের ধারণা। এই মহৎপ্রাণ মানুষদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমে।

ডঃ পি.বি.সালিম, আই.এ.এস
চেয়ারম্যান
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

ভূমিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা গেছে কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় এবং ত্যাগ দ্বারা হয়ে ওঠেন কালজয়ী। মুক্ত চিন্তা ত্যাগ ও মানবজাতির সেবার মাধ্যমে তাদের কাজ চিন্তাভাবনা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম এরূপ মনীষীগণের জীবন ও কর্মসাধনা এ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। WBMDFC-Knowledge Series বিভাগে প্রথম চারজন মনীষী হাজি মহম্মদ মহসিন, ডঃ হাসান সোহরাওয়ার্দী, তিতুমির ও ভগিনী নিবেদিতার কর্মসাধনা অতি সংক্ষেপে এ বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা আশা রাখি এই পুস্তিকাটি পড়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উপকৃত হবে।

মৃগাঙ্ক বিশ্বাস, ডব্লিউ.বি.সি.এস (এক্সিকিউটিভ)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

তিতুমির

স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রথম শহীদ ও কৃষক আন্দোলনের মহানায়ক

সাইফুল্লা

প্রকাশকাল
মিলন উৎসব
ফেব্রুয়ারি, ২০২০

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

তিতুমির

স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রথম শহীদ ও কৃষক আন্দোলনের মহানায়ক

দেশ-কালের কথা

সহস্রাধিক বৎসরব্যাপী বিস্তৃত বাঙালি জাতি-সংস্কৃতির ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধ। যুদ্ধ সেদিন এমনিতে নৈমিত্তিক বিষয় ছিল। কিন্তু পলাশির যুদ্ধ ছিল তার মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এই যুদ্ধে রক্তপাত হয়েছিল সামান্যই। তুলনায় এর পরোক্ষ অভিঘাত ছিল অনেক বেশি। বলা যায় আমাদের জাতীয় জীবনের চরিত্র বদল হয়েছিল এই যুদ্ধের সূত্রে। সেই প্রথম দিন থেকে সেদিন পর্যন্ত মোটের উপর এক জাড্য জীবনবোধকে পাথেয় করে পথ হাঁটছিলাম আমরা। সেই অর্থে কোথাও তেমন কোনো ওঠাপাড়া ছিল না। রাজশক্তির, সময়ে সময়ে রাজধর্মেরও পরিবর্তন হয়েছিল যথানিয়মে, কিন্তু তাতে জাতীয় জীবনে বিশেষ কোনো হেলদোল লক্ষ করা যায়নি। জীবন বয়ে চলেছিল তার নিজস্ব ছন্দে। এক্ষেত্রে গুরুতর ছন্দপতন ঘটল উত্তর পলাশির যুদ্ধ পর্বে। জাতি এই প্রথম এমন এক জীবন ও সংস্কৃতির মুখোমুখি হল যা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের; একেবারে অচেনা। এমন অচেনা সংস্কৃতির সঙ্গে সমঝোতা করা মোটেই সহজ ছিল না; তবু সমঝোতা করতে হল। আর এটা করতে গিয়ে খেলতো হলো বহু ভাঙাগড়ার খেলা। সে খেলার সূত্রে জীবনের অনেক সমীকরণ গেল বদলে।

জাতি হিসেবে বাঙালি, সেইসঙ্গে ভারতীয়রাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বহির্দেশীয় শক্তি কর্তৃক পরাভূত ও শাসিত হয়েছিল, কিন্তু সেই অর্থে কখনো পরাধীনতার যন্ত্রণা অনুভব করতে হয়নি। কেন না, সেক্ষেত্রে বিজয়ী রাজন্যবর্গ এদেশ শাসন করতে করতে একদিন এখানকারই ভূমিপুত্রে পরিণত হয়েছিলো। এই প্রথম তার ব্যতিক্রম ঘটলো। এবারের রাজশক্তি বাঙালি বা ভারতীয় কোনো জাতি-সংস্কৃতির

সঙ্গে কোনোরকম একাত্মতা অনুভব করলো না; তারা বহিরাগত শাসকমাত্রই হয়েই থাকলো। এবং এখানেই শেষ নয়। আরও পার্থক্য তৈরি হলো। অপরাপর বহিরাগত রাজশক্তি যেখানে তাদের রাজদণ্ডকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলো সামন্ততান্ত্রিক জীবনবোধের ভিত্তিভূমিতে নতুন রাজশক্তি সেখানে আমদানি করলো ধনতান্ত্রিক জীবনবোধকে। ব্যবসাবৃত্তি এবং মুনাফাই যেখানে শেষ কথা। নতুন রাজারা এদেশ দখল করেছে এখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা জন্য নয়; তাদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য এখানকার সম্পদকে লুঠেপুটে নিয়ে যাওয়া ও সেই সম্পদ নিয়ে নিজেদের দেশকে সুসজ্জিত করা। তারা

অনুভর করেছিলো তাদের এই সংকীর্ণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়ার পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা এখানকার সম্মিলিত জনশক্তি। বিরাট এই জনশক্তির সমন্বিত প্রতিরোধ দানা বাঁধলে তাদের শাসনতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণরাখা মোটেই সুবিধার হবে না। কাজেই ডিভাইড অ্যান্ড রুলস এর পথ ধরলো তারা। প্রথমেই জমিদার শ্রেণিকে কাছে টেনে নেওয়া হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে। এতকাল জমির মালিক ছিল কৃষকরা। নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদান করে কৃষক জমির উপর নিজস্ব অধিকার বজায় রাখতে পারতো। নতুন বন্দোবস্তের সূত্রে কৃষক জমির উপর তার অধিকার হারালো এখন জমির প্রকৃত মালিক হয়ে উঠলো জমিদার শ্রেণি। বৎসরান্তে রাজকোষাগারে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব জমা করতে পারলেই জমিদার তার জমিদারি এলাকার সর্বময়কর্তা। জমিদার ইচ্ছা করলে যে কোনো প্রজাকে যে কোনো সময়ে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারে। এইসময় সরকার-পক্ষ

থেকে এমন কিছু আইন করা হয় যে আইন বলে জমিদার তার জমিদারিতে নতুন নতুন করে প্রবর্তনের অধিকারী হয়, অনাদায়ী করের জন্য প্রজার উপর নিপীড়ন, এমন কি সাময়িকভাবে কয়েদ পর্যন্ত করতে পারে। এমনভাবে অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় জমিদারশ্রেণি তাদের কৃতজ্ঞতার ডালি উপুড় করে দেয় নতুন রাজার উদ্দেশ্যে।

এদিকে এতে এতদিনের প্রচলিত সামাজিক সমীকরণে বড় রকমের ফাটল ধরলো। এতদিন প্রজা বা কৃষকরা ছিল রাজা বা জমিদারের স্থায়ী সম্পত্তির মতো। রাজা ও জমিদার যেই হোক,তারা প্রজাদের শোষণ করতো রইয়ে সইয়ে। তারা জানতো কৃষক যদি শেষপর্যন্ত জমিতে বহাল না থাকে, তারা যদি গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায় তবে সমূহ সর্বনাশ। জমি অনাবাদি থাকলে তার চূড়ান্ত প্রভাব পড়বে কোষাগারে। কাজেই প্রজাকে সুস্থ রেখে তবে তাকে শোষণ করতে হবে। নতুন রাজা বা নতুন জমিদারদের এসব সমীকরণের ধার ধারার প্রয়োজন হলো না। তারা দেশ শাসন বা জমিদারি করতে এসেছে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে। দীর্ঘমেয়াদি কোনো লক্ষ্য তাদের নেই। যত দ্রুত যত বেশি সম্ভব অর্থ ঘরে তোলা তাদের অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য। কাজেই সম্ভাব্য সব দিক থেকে নিষ্পেষণের রোলার চালিয়ে দিলো তারা। এতে ভয়ঙ্করভাবে বিপর্যস্ত হলো আমাদের জনজীবন। সীমাহীন নির্যাতনের শিকার হয়ে এরকম দিশাহারা অবস্থা হলো সাধারণ মানুষের। তাদের এই দিশাহারা অবস্থার উপর নতুন মাত্রা সংযুক্ত হল নীলকর ও নীলচাষের সূত্রে। বাংলার মাটি নীলচাষের জন্য খুব উপযুক্ত। কাজেই বাংলার দিকে খুব করে মনোযোগী হলো ইংরেজ নীলকররা। তারা জোর করে ধানের জমিতে নীল বুনতে বাধ্য করলো কৃষকদের। যারা তাদের কথা মতো নীল চাষ করলো না তাদের উপর কখনো অত্যাচার অবিচারের চূড়ান্ত করা হলো, কখনো বা ঋণের জালে জড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধকর এক অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেওয়া চললো। অত্যাচার

ক্রমশ অসীমান্তিক হয়ে উঠছে, এদিকে প্রতিবিধানের কোনো পথ তখনও সুস্পষ্ট নয়। ইতিহাসের এমনই সংকটকালে বাংলার তথা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের অন্য অর্থে কৃষক সমাজের মুক্তির দিশারী হয়ে আত্মপ্রকশ করেছিলেন তিতুমির। নিপীড়িত, লাঞ্ছিত কৃষকদের পক্ষ নিয়ে অত্যাচারী শাসক ও জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে তাঁর এই যে রুখে দাঁড়ানো ঘটনা পরম্পরায় তা রাজবিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল। তখন জমিদারদের প্রধান রক্ষাকবচ ছিল সরকার। তিতু যখন জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, তখন জমিদারদের হয়ে সরকারপক্ষ মাঠে নামলো; এতে বিরোধের আগুন জ্বলে উঠেছিল সবদিক থেকে। সেদিনের সে ভয়াবহ আগুন দেখে ভয় পেয়ে যাননি তিতু। তিনি পরিস্থিতিকে জয় করে হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন একমেবাদ্বিতীয়ম; স্বপ্ন দেখেছিলেন শোষণ মুক্ত এক সমাজ-রাষ্ট্রে সর্বাধিনায়ক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। তবু তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। সীমায়িত সামর্থ্য নিয়ে বিরাট রাজশক্তির মোকাবিলা করতে গিয়ে পরাস্ত হতে হয়েছিলো তাঁকে। যুদ্ধক্ষেত্রে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে শেষাবধি মৃত্যুশয্যায় শয়ন

করেছিলেন তিতু।

তিতু আক্ষরিক অর্থে অবশ্যই পরাস্ত হয়েছিলেন; ব্যর্থ হয়েছিল তাঁর লড়াই। কিন্তু তাৎপর্যগত অর্থে তাঁর এই পরাজয় কোনো পরাজয় নয়, বরং মহৎ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। বলা যায় উত্তরকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য যে আপোষহীন লড়াই চলেছিল তার শুভ সূচনা হয়েছিল নারকেলবেড়িয়ার লড়াইকে কেন্দ্র করে। স্বাধীনতার লড়াই-এর পাশাপাশি পরাধীন ভারতে তো বটেই উত্তর স্বাধীনতা পর্বেও আমাদের দেশে আর এক লড়াই জারি রয়েছে, সে লড়াই এর অন্য নাম কৃষকদের অন্য অর্থে নির্যাতির মানুষের স্বাধিকারের সংগ্রাম। তীতু ও তাঁর লড়াইকে ঘিরে ব্রিটিশ ভারতে যার সূত্রপাত হয়েছিল। সেদিক থেকে দেখলে তিতু ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী; সেইসঙ্গে কৃষক আন্দোলনের জনক তুল্য ব্যক্তিত্ব।

তিতুমির ও তাঁর কর্মময় জীবনের কথা

জেলা ২৪ পরগনার একটি গণ্ডগ্রাম হয়দারপুর। এই গ্রামেই ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমির জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মীর হাসান আলি, মাতা আবেদা রোকাইয়া খাতুন। হয়দারপুর গ্রামের যে পরিবারে তিতুমিরের জন্ম হগয়েছিল তাদের পারিবারিক কৌলীন্য বিশেষ ছিল না; আবার তাঁরা যে নিতান্ত সাধারণ মানুষ ছিলেন তাও নয়। বলা যায় সামাজিক সম্মানের নিরিখে সাধারণের চেয়ে সামান্য উঁচুতে ছিল তাঁদের অবস্থান। তিতু তাঁর বাবা মায়ের একাধিক সন্তানের একজন ছিলেন। যতদূর জানা যায় তাঁর আরও এক ভাই ও দুই বোন ছিল। সেদিনের আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের মতো একান্নবর্তী পরিবারে ছোটো থেকে বড়ো হয়েছিলেন তিতুমির।

যতদূর জানা যায় বাল্যকালাবধি তিতু এমন কোনো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন

ছিলেন না যাতে করে তাঁকে আলাদাভাবে চিনে নেওয়া যেত। দেহসৌষ্ঠবে তিনি অনেকের থেকে একটু এগিয়ে ছিলেন এই যা। ভবিষ্যতের একজন অতীব সুপুরুষ হয়ে ওঠার যাবতীয় লক্ষণ তখন থেকে তাঁর মধ্যে পরিস্ফুট ছিল। সেদিনের অপরাপর মুসলমান পরিবারের মতো তিতুর পরিবারও ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। পারিবারিক সূত্রেই বাল্যাবধি তিতু ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে উঠেছিলেন। এখনকার মতো তখন গ্রামেগঞ্জে এত স্কুল ছিল না। তবে গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন সম্পন্ন পরিবারের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ছোটোদের ন্যূনতম শিক্ষাদীক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত ছিল। তিতুদের গ্রামও এর ব্যতিক্রম ছিল না। সেখানেও একটি মক্তব ছিল এবং বালক তিতু ওই মক্তবে পড়াশুনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিতুর বাল্যাবস্থায় তাঁদের গ্রাম্য মক্তব্যের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন হাফিজ নিয়ামতউল্লাহ। তিনি রীতিমতো পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। তাঁর সাহচর্যে আঠারো বৎসরাবধি বিদ্যাচর্চা করে তিতু একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। আরবি, ফারসি, বাংলা এই তিন ভাষায় তাঁর দখল ছিল অসামান্য; ইসলাম শাস্ত্র, গণিত বিদ্যা প্রভৃতিতেও তিনি কমবেশি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনের পাশাপাশি তিতু এইসময় মনোযোগী হয়েছিলেন শরীরবিদ্যার চর্চায়। পালোয়ান হিসেবে তাঁর নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। একসময় কলকাতার বিখ্যাত পালোয়ান আরিফ আলিকে পরাস্ত করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অদ্বিতীয় পালোয়ান।

তিতুর পরিবার অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল এমন নয়। তাই একটা সময়ের পর তিতুকে রোজগারের দিকে আলাদা করে নজর দিতে হয়েছিল। প্রথম জীবনে আমরা তাঁকে জমিদারের লাঠিয়াল রূপ জীবিকায় বহাল হতে দেখি। নদিয়ার বেশ কয়েক জন জমিদারের লাঠিয়াল শ্রেণির সদস্য পদ নিয়েছিলেন তিনি। কুস্তিগীর তিতুর জন্য সেদিন কাজ বেশ উপযুক্ত ছিল। লাঠিয়ালের ভূমিকায় রীতিমতো সপ্রতিভ ছিলেন তিনি। এদিকে এই সপ্রতিভতাই তাঁকে

টেনে নিয়ে গিয়েছিল বিপদের মাঝখানে। জমিদারি দাঙ্গা-হাঙ্গামায় নাম জড়িয়ে যায় তাঁর। সেইসূত্রে সশ্রম কারাদণ্ড পোহাতে হয় তিতুকে।

তিতু তখন বিবাহিত পুরুষ। তাঁর দুটি পুত্র ও একটি কন্যা বর্তমান রয়েছে। এই অবস্থায় জমিদারি-হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে জেলখাটার বিষয়টি একেবারে উপাদেয় বলে মনে হয়নি তাঁর। তিনি দ্রুত জমিদারের লাঠিয়ালের চাকুরি থেকে ইস্তফা দেন। তখন ঘটনাচক্রে উত্তর ভারতীয় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তিতুর পরিচয় হয় এবং তিতু তাঁর সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণে যান। উত্তর ভারত ভ্রমণকালে সেখানকার কিছু ধর্মীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়। এই আলাপের ফলশ্রুতিতে তিতু একসময় হজ্ব করার লক্ষ্যে পবিত্র মক্কা নগরীর পথে যাত্রা করেন। হজ্ব করতে এসে তিতু বিশেষ ভাবে পরিচিত হন সেদিনের স্বনামধন্য ধর্মগুরু সৈয়দ আহমদের সাথে। ওয়াহাবী ভাবধারায় দীক্ষিত স্যার সৈয়দ আহমদের তখন দিবারাত্রের স্বপ্ন ছিল নানা রকম গোমরাহীতে লিপ্ত ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়কে প্রকৃত ইসলামের আদর্শে দীক্ষিত করা। স্বপ্নপূরণের পথ অন্বেষণ করার পথে তিতুর সঙ্গে কথা বলে তিনি খুবই প্রীত হন এবং তাঁকে ওয়াহাবী ভাবধারায় দীক্ষিত করেন। সময়টা ছিল ১৮২২ খ্রিস্টাব্দ।

উল্লেখ্য, ওয়াহাবী আন্দোলন বা ওয়াহাবী আদর্শ ইসলাম ধর্মের ভিতরকার একটি ব্যাপার। নবী মুহম্মদ (সঃ) মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ইসলাম আরব ভূখণ্ড ছাড়িয়ে বিশ্বের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে সেখানকার মানুষের নিজস্ব জীবনবোধ ও সংস্কৃতি ইসলামি সংস্কৃতির উপর ঘনিষ্ঠভাবে ছায়াপাত করে। এতে ইসলামের নিজস্বতা কমবেশি নষ্ট হয়। কোরান-হাদিসের আদর্শ থেকে সরে এসে মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই তাদের মনগড়া অনেক কিছুকে ইসলাম-অনুসারী বিষয় হিসাবে বর্ণনা করতে চায় এবং সেই

অনুসারে নিজেদের জীবনকে রচনা করার চেষ্টা করে। এই বিষয়টি নিতান্ত না পছন্দ হয়েছিল মক্কার অধিবাসী মাওলানা আবদুল ওহাবের। তিনি এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। সমস্ত রকম দেশাচার ও লোকাচার থেকে মুক্ত করে কেবল কোরান-হাদিসের আলোকে ইসলামকে শুদ্ধতম রূপে প্রতিষ্ঠিত করার ডাক দেন তিনি। তাঁর এই ডাকে সাড়া দেন অনেকেই। তৈরি হয় একটি আন্দোলন। মাওলানা আবদুল ওয়াহাব এই আন্দোলনের প্রবর্তক ও প্রাণপুরুষ; তাঁর নাম অনুসারে আন্দোলনটি ওয়াহাবী আন্দোলন নামে পরিচিতি পায়।

যে প্রেক্ষিতে ওয়াহাবী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সেই প্রেক্ষিতটি বিশেষভাবে কার্যকর ছিল সেদিনের ভারতবর্ষে এবং তারও বিশেষ কারণ ছিল। একটা সময় পর্যন্ত দেশে দেশে যে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নেপথ্যে রাজশক্তির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পরে অবস্থার পরিবর্তন হয়। রাজন্যবর্গ সরাসরি জনগণের মধ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জায়গা থেকে সরে আসে। ইতিহাসের এই পর্বে ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন হয়েছিল। ফলত ভারতীয় জীবজীবনে রাজকীয় পথে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ঘটেনি। এখানে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল মুখ্যত সুফি সাধক সম্প্রদায়ের দ্বারা। সুফি সাধকরা অন্তরের বিশুদ্ধতায় যতটা বিশ্বাস ছিলেন শরা-শরিয়তের বাহ্যিক নিয়ম কানুনের প্রতি তাঁদে তত আস্থা ছিল না।। আর এর ফল হয়েছিল মারাত্মক। সুফি সাধকদের হাত ধরে সেদিনের ভারতবর্ষে যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল তারা ইসলামের তাত্ত্বিক রূপের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। ফলত একটা শূন্যস্থান তৈরি হয়েছিল। এই শূন্যস্থন পূরণ করার জন্য ভারতীয় নব মুসলিম সমাজ আর কিছু না পেয়ে তাদের সনাতন সংস্কৃতিকেই আঁকড়ে ধরেছিল। সব মিলিয়ে ইসলামের প্রকৃত আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে দেশীয় সংস্কৃতি ও ইসলামি ভাবনার সমন্বয়ে নতুন এক জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারা। আর অপরাপর ভারতবর্ষের

তুলনায় বঙ্গদেশে এই ঘটনার অনুবর্তন হয়েছিল আরও বেশি করে। তিতু যখন সৈয়দ আহমদের আদর্শে দীক্ষিত হলেন তখন তাঁর কাছে স্বসমাজের এই বিচ্যুতির দিকটি প্রকট হয়ে দেখা দিল। মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর (১৮২২ খ্রিস্টাব্দ) তিনি এমন বিচ্যুতি থেকে বাংলার মুসলমান সমাজকে উদ্ধার করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। প্রথমে একান্ত পারিবারিক পরিমণ্ডলে শুরু হল তাঁর প্রচার। অতঃপর তা ক্রম প্রসারিত হল। তাঁর কথা মতো অনেকেই পীর প্রথা, কবর পূজা এই জাতীয় দেশীয় লোকাচার থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলো। এইসূত্রে একটা সময়ে তিতু ধর্মগুরু হিসাবে রীতিমতো মান্যতা পেতে শুরু করলেন। শত শত শিষ্যবর্গ তখন তাঁকে ঘিরে থাকছিল। অনুকূল অবস্থার প্রেক্ষিতে তিতু তাঁর শিষ্যবর্গের জন্য ড্রেস কোর্ড থেকে শুরু করে আচরণবিধি পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে দিলেন। তিতুর শিষ্যমাত্রকে দাড়ি রাখতে হত, বিশেষ পদ্ধতিতে ধুতি পরতে হতো। এমন আলাদা রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য সাধারণের মধ্যে তিতুর শিষ্যরা সহজেই নিজস্বতায় ভাস্বর হলো। নিজস্বতার এই বিষয়টি তারা উপভোগ করলো যারপরনাই। এদিকে বিষয়টি সম্পূর্ণ না পছন্দ হলো অন্যদের। বিশেষত জমিদার শ্রেণির, সেই সঙ্গে মুসলমান সমাজের একাংশেরও।

বাংলার মুসলমান সমাজ তখন মোটের উপর পীরতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলো। এদিকে তীতুর বিশেষ লড়াই ছিলো পীরতন্ত্রের বিরুদ্ধে। এই অবস্থায় পীর ও তাঁর শিষ্যবর্গ উল্টো দিক থেকে তিতু ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করলো। তারা অন্য পথে বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে সরসারি জমিদারের কাছে গিয়ে তিতুদের নামে বিধিবদ্ধ অভিযোগ দাখিল করলো। জমিদার কৃষ্ণদেব রায় মহাশয় অভিযোগ শুনে নড়ে চড়ে বসলেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি তিতুর বিষয়ে নানা খবর পাচ্ছিলেন এবং তার কার্যকলাপে একেবারেই সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। এখন তিনি তিতুকে জব্দ করার পথ পেয়ে গেলেন। তাই অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে মাঠে

নামলেন। তিতুর শিষ্যমাত্রকে দাড়ি রাখতে হতো। জমিদার মহাশয় প্রথমেই এই জায়গায় আঘাত করার জন্য মনস্থির করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, তাঁর এলাকায় যারাই দাড়ি রাখবে তাদেরকে আড়াই টাকা হিসাবে অতিরিক্ত কর দিতে হবে। জমিদারের সিদ্ধান্ত প্রচারিত হওয়া মাত্র দিকে দিকে সাড়া পড়ে গেল। তিতু ও তাঁর শিষ্যবর্গ রীতিমতো অসন্তুষ্ট হলেন এবং অচিরেই এর অশুভ ফল ফলতে শুরু করলো। জমিদার মহাশয় যেমন জোর জবরদস্তি করে দাড়ি-কর আদায়ে বদ্ধপরিকর হলেন অন্যপক্ষ তেমনি এই কর না দেওয়ার বিষয়ে দ্বিধাহীন অবস্থান নিলো। ফলত সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠলো।

যতদূর জানা যায়, প্রাথমিকভাবে জমিদার মহাশয় পুঁড়া গ্রামের বেশ কয়েকজন লোকের দাড়ি-কর আদায়ে সক্ষম হয়েছিলেন। যারা তৎক্ষণাৎ ওই কর পরিশোধ করতে পারেনি তারা সময় নিয়েছিলো। পার্শ্ববর্তী গ্রাম সর্পরাজপুরেরও বেশ কয়েকজন লোক দাড়ি কর দিতে সম্মত হয়েছিলো। এমনভাবে একদিকে যখন ঘটনা- স্রোত জমিদারের অনুকূলে বইছিলো অন্যদিক তেমনি প্রতিরোধের প্রাচীর রচনা করেছিলেন তিতু ও তাঁর সম্প্রদায়। তারা সাধারণের মধ্যে প্রচার করতে শুরু করলো যেন কিছুতেই এই কর না দেওয়া হয়। তাদের এই প্রচারে উৎসাহিত হলো অনেকেই। যারা ইতিমধ্যে সম্মত হয়েছিলো তারাও বেঁকে বসলো। বেঁকে বসা প্রজাদের শায়েস্তা করার জন্য তাদেরকে ধরে আনার নির্দেশ দিলেন জমিদার মহাশয়। সেই অনুসারে লাঠিয়ালরা ছুটলো। তবে তারা মোটেই সুবিধা করতে পারলো না। তিতুর লোকজন কর্তৃক পরিবেষ্টিত রয়েছে ওইসব অবাধ্য প্রজারা। তাদের পরিবেষ্টন থেকে এদেরকে বার করে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তারা তাই শূন্য হাতে ফিরে গেল এবং জমিদার মহাশয়কে পরিস্থিতির পরিচয় দিল। বিষয়টি নিতান্ত অসহ্য মনে হল কৃষ্ণদেব রায়ের। তিনি তিতু ও তাঁর সম্প্রদায়কে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা ভাঁজতে লাগলেন। অতঃপর একটা সময়ে

উপযুক্ত পরিমাণ লোকলস্কর নিয়ে চড়াও হলেন তিতুদের ওপর। তিতু তখন সর্পরাজপুর গ্রামে শিষ্যবর্গ সহ অবস্থান করেছিলেন। জমিদারের লোকজন এই গ্রাম আক্রমণ করলো। এমন সহসা আক্রমণের জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিলো না তিতুর লোকজন। তারা সেভাবে কোনো প্রতিরোধ রচনা করতে পারলো না। জমিদার পক্ষ একরকম বিনা বাধায় গ্রামটিকে তছনছ করেদিল। সময়টা ছিলো জুন ১৮৩১। এইরকম অন্যায়ভাবে নির্যাতিত হওয়ার পর তিতু আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ২৭ জুন বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করা হলো। এদিকে পরিস্থিতি অন্য দিকে বাঁক নিতে পারে অনুমান করে জমিদার মহাশয়ের পক্ষ থেকে ঘটনা ঘটার আঠারো দিন পরে তিতু-পক্ষীয়দের বিরুদ্ধে আলাদা করে একটি মামলা ঠুকে দেওয়া হলো। জোড়া মামলার প্রেক্ষিতে কর্তা ব্যক্তিরা নড়েচড়ে বসলেন। নিরপেক্ষ তদন্তের সিদ্ধান্ত হলো। প্রাথমিকভাবে তদন্তের ভার পড়ল বসিরহাট থানার আধিকারিক রামরাম চক্রবর্তী মহাশয়ের উপর। খুব সম্ভব রামরাম বাবু জমিদার বাবুর আত্মীয়জনদের একজন ছিলেন। তার উপর স্বজাতির প্রতি তার একটু সহজাত অনুরাগ থাকা স্বাভাবিক। সবমিলিয়ে তদন্ত করতে বসে তিনি নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারলেন না। পক্ষপাতদুষ্ট একটি রিপোর্ট কর্তাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। এমন পক্ষপাতদুষ্ট রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বারাসাতে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে মামলার শুনানি শুরু হলো। শুনানি শেষ হয়ে গেলো, কিন্তু বিচারক মহাশয় কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না। স্থির সিদ্ধান্ত করতে না পারায় তিনি সামান্য জরিমানার বিনিময়ে উভয় পক্ষকে খালাস করে দিলেন। ২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ এ মামলাটি ডিসমিস হয়ে যায়।

আদালত কর্তৃক নিরপরাধী প্রতিপন্ন হওয়ার পর জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের প্রভাব প্রতিপত্তি সীমাহীন হয়ে পড়লো। তিনি তখন আরও বেশি করে দমন পীড়ন শুরু করলেন। এতে তিতু ও তাঁর

সঙ্গীসাথীদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তিতু উপায়ান্তর না দেখে আবারও আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। তিনি তাঁর ডান হাত স্বরূপ গোলাম মাসুমকে নতুন করে বারাসাতে প্রেরণ করলেন আদালতে নালিশ করার জন্য। একদল নির্যাতিত রায়ত সহ মাসুম ২৫ সেপ্টেম্বর বারাসাতে এসে দেখলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারক তখন অফিসে উপস্থিত নেই। তিনি বাখরগঞ্জ অঞ্চলে গেছেন অন্য কাজে; ফিরতে সময় লাগবে। নিরুপায় হয়ে মাসুমরা ফিরে এলেন তাঁদের এলাকায়। এদিকে জমিদারের অত্যাচার বেড়েই চললো। অবস্থার প্রেক্ষিতে তিতু শেষপর্যন্ত তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। না, আর সরকারের বিচার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করা নয়, নিজেদের ভাগ্য এখন নিজেদেরকেই গড়ে নিতে হবে। সেই অনুসারে ঘোষণা দিলেন তিনি। এই ঘোষণা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। জমিদারের বিরুদ্ধে উড়িয়ে দেওয়া হলো বিদ্রোহের জয়-পতাকা।

বিদ্রোহের কথা

বিদ্রোহের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে তিতু ও তাঁর লোকজন অচিরে মারমুখি হয়ে উঠল। তারা চড়াও হল কৃষ্ণদেব রায় সহ এলাকার অপরাপর জমিদারদের উপর। জমিদারদের বিরুদ্ধে তাঁদের এই সংগ্রাম কালক্রমে অন্য মাত্রা নিলো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রে জমিদার শ্রেণি যে কার্যত জমির মালিক হয়ে উঠেছিল তার সূত্রে তারা ইচ্ছামত প্রজাদের উপর দমন পীড়ন করতো; আর এ কাজ করার সময় হিন্দু-মুসলমান কোনো বাছবিচার করতো না। তাই প্রজামাত্রই তাদের হাতে নির্যাতিত হতো। এইসব নির্যাতিত প্রজারা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তিতুর হাতে হাত রাখল এবং জমিদারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের শপথ নিলো। এতে বিদ্রোহের চরিত্র অনেকটাই বদলে গেলো। যা ছিলো মুসলমান সমাজের একটা অংশের বিদ্রোহ বিশেষ তা কার্যত গণসংগ্রামের রূপ নিলো।

Born : Syed Mir Nisar Ali (Titumir)
27 January 1782

Died : 19 November 1831
(Aged 49)

একদিকে যেমন তিতুর দলে অনেক অমুসলিম লোক নাম লিখিয়ে তাঁর আন্দোলনের চরিত্রটিকে বদলে দিলো অন্যদিকে তিতুও তেমন পরিস্থিতির সম্যক পাঠ নিয়ে নিজেকে অকেটা বদলে ফেললেন। এখন আর তিনি নিছক ধর্মীয় বিষয়াদি বা তাঁর দলের লোকজনদের সাধারণ সমস্যার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলেন না। দলীয় লোকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তিনি বিশেষ মনোযোগী হলেন। জমিদাররা যেমন প্রজাপীড়ক তেমনি জমিদার নয় এমন অনেক ভূস্বামীরাও যথেষ্ট মাত্রায় প্রজাদের উপর পীড়ন করে থাকে; এই প্রজাপীড়ক শ্রেণির মধ্যে কেউ কেউ মুসলিমও রয়েছে। প্রজাদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করতে বসে তিতু এক্ষেত্রে কোনোরকম ভেদবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিলেন না। তিনি অন্যদের পাশাপাশি এইসব মুসলিম জোতদার, গাতিদারদের বিরুদ্ধেও গর্জে উঠলেন। ইয়ার বক্সের মতো আরও অনেক সম্পন্ন মুসলমানের বাড়ি লুঠ করা হলো।

সেদিন জমিদার-জোতদারদের পাশপাশি আর যাদের অত্যাচারে গ্রাম বাংলার মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো তারা হলো নীলকর-সম্প্রদায়। নীলকর সম্প্রদায়ের অত্যাচার অবিচারের কথা আমাদের সকলেরই কমবেশি জানা। তাই তা নিয়ে কথা না বাড়ালেও চলে। এক্ষেত্রে শুধু এইটুকু বললে যথেষ্ট হবে যে সেদিন বাংলাদেশের যে সব জায়গা নীলকরদের দ্বারা খুব বেশি ধ্বস্ত হয়েছিল তিতুর এলাকাধীন গোবড়ডাঙ্গা অঞ্চল ছিল তার একটি। ষ্ট্রম, এনড্রুজদের মতো একাধিক প্রবল প্রতাপশালী নীলকরের অবাধ বিচরণ ভূমি ছিল এই অঞ্চল। তিতু জমিদারদের পাশাপাশি এই নীলকর শ্রেণিকেও তাঁর নিশানা করলেন। বারঘরিয়ার নীলকুঠি লুঠ করা হলো। নীলকররা জোর করে নীল চাষ করানোর পাশাপাশি রায়তদের খুব করে জব্দ করত মিথ্যা ঋণের মামলা করে। তিতু ও তাঁর লোকজন তাই আলাদা ভাবে নজর দিলেন নীলকুঠির কাগজপত্রের দিকে। রক্ষিত কাগজপত্র একত্রিত করে জ্বালিয়ে

দেওয়া হলো। যাতে এইসব নথি যেখানে ঋণ গ্রহীতা হিসাবে প্রজাদের স্বাক্ষর আছে তার সাপেক্ষে নীলকররা আদালতে মামলা করতে না পারে। সবমিলিয়ে বিদ্রোহের আগুন চারিদিক থেকে জ্বলে উঠল।

বিদ্রোহের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তিতু জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের ওপর চড়াও হয়েছিলেন। তিতু পক্ষীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনুধাবন করে জমিদাররাও ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো। কৃষ্ণদেব বিশেষ দল গঠন করে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য তৈরি থাকলেন। তিতুকে তাই অপেক্ষা করতে হলো উপযুক্ত সুযোগের জন্য। অবশ্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না। সুযোগ মিলে গেলো। সেই অনুসারে ৬ নভেম্বর তারিখে পুঁড়া গ্রাম আক্রমণ করা হলো। জমিদার পক্ষ এই আক্রমণের বিপরীতে তেমন কোনো প্রতিরোধ তৈরি করতে পারলো না। তিতুর লোকজন তাদের খুশি মতো লুঠপাঠ চালিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে বিজয়ীর বেশে ফিরে এলো। এইভাবে তিতুর হাতে ধ্বস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে জমিদার শ্রেণির গায়ের জ্বালা সীমাহীন হয়ে উঠলো। মরিয়া হয়ে তারা তিতুর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নিলো। তাদের এই সিদ্ধান্তের শরিক হলো নীলকররাও। জমিদার কালীপ্রসন্ন বাবুর সঙ্গে বিশেষ সখ্যতা ছিল মোল্লাহাটীর কুঠির ম্যানেজার ডেভিস সাহেবের। কালীপ্রসন্ন বাবুর অনুরোধে ডেভিস সাহেব তিতুকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত লোকবল নিয়ে যাত্রা করলেন। পাশাপাশি গোবরা গোবিন্দপুরের জমিদার মহাশয় বিশেষ রূপে প্রস্তুত হয়ে থাকলেন। তিতু জমিদার ও নীলকরদের এই উদ্যোগের খবর পেয়েছিলেন আগে থেকেই। তিনিও তাই লোকলস্কর নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। উভয়পক্ষ মুখোমুখি হতে তুমুল লড়াই শুরু হলো। এই লড়াই এ ডেভিস সাহেব সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হলেন এবং কোনোক্রমে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করলেন। এদিকে গোবরা গোবিন্দপুরের জমিদারের পক্ষ থেকে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলা হলেও শেষরক্ষা

হলো না। জমিদার পুত্র দেবনাথ রায় সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হলেন।

সম্মিলিত প্রয়াস এইভাবে ব্যর্থ হওয়ায় জমিদার পক্ষ প্রমাদ গুণলো। তারা বুঝতে পারলো এভাবে সীমাবদ্ধ শক্তির উপর ভর করে তিতুর বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না। তাই তারা ইংরেজ রাজশক্তির শরণাপন্ন হওয়ার চেষ্টা করলো। সরকারের সাহায্য চেয়ে একের পর এক চিঠি লেখা চললো। দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় সরকারি আধিকারিকরাও ঘটনার গুরুত্ব বর্ণনা করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চিঠি লিখলেন। সরকার প্রথম দিকে বিষয়টির উপর তেমন গুরুত্ব না দিলেও একটা সময়ের পর তারা এ বিষয়ে মনোযোগী হতে বাধ্য হলো। বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারের কাছে উপর মহল থেকে নির্দেশ আসলো বিষয়টি দেখভাল করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্দেশিত হওয়ার পর আলেকজান্ডার সিপাহী, বরকন্দাজ, জমাদার প্রভৃতি সহযোগে ১৩ নভেম্বর তিতুর বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন। এদিকে এই যাত্রার ফলও শুভ হলো না। আবারও পরাভূত হতে হলো শাসক শক্তিকে। আলেকজান্ডার কোনোক্রমে পলায়ন করে জীবন রক্ষা করলেও তার দলের অনেকেরই উক্ত যাত্রাই শেষ যাত্রা হলো। সবচেয়ে করুণ পরিণতি হলো বসিরহাট থানার দারোগার। পলায়নপর দারোগাকে তিতুর লোকজন যথাসময়ে ধরে ফেলে এবং তার দেহকে টুকরো টুকরো করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। সরকারি রিপোর্টে তিতুর হাতে ইংরেজ প্রভুদের সেদিনের সেই শোচনীয় পরাভবের পরিচয় ধরা রয়েছে।

প্রথম বারের অভিযান শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হওয়া ও এই সংক্রান্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে কোম্পানি এবার কঠোরতর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উদ্যোগী হয়। সিদ্ধান্ত করা হয় আলেকজান্ডারের নেতৃত্ব কামান এর মতো অতি সক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য অভিযান করা হবে। যথাসময়ে এই অভিযান পরিচালিত হয় এবং

উক্ত অভিযানই তিতুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অভিযানের রূপ নেয়। তবে সে কথায় আসার আগে তিতু সম্পর্কিত আরও কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার। জমিদার থেকে নীলকর, অত্যাচারীদের একে একে তিতুর হাত পরাস্ত হওয়ায় দিনে দিনে তাঁর দলে লোক বৃদ্ধি পাচ্ছিল। প্রথমে জমিদারদের বিরুদ্ধে, পরে নীলকরদের বিরুদ্ধে তাঁর সাফল্য সাধারণের মধ্যে অন্য রকম প্রত্যয়ের জায়গা তৈরি করলো। তারা আরও বেশি করে তিতুর দলে নাম লেখালো। বিপুল এই জনসমর্থনের প্রেক্ষিতে তিতু একদিন স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। কোম্পানির রাজত্বকে অস্বীকার করে তিতু নিজেকে নতুন সম্রাট হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হলেন। এলাকায় ঘোষণা দেওয়া হল এখন থেকে আর কোম্পানিকে রাজস্ব দেওয়া নয়, পরিবর্তে নতুন সম্রাট অর্থাৎ তিতুমিরকেই রাজস্ব প্রদান করতে হবে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে অনেক জমিদারও তিতুর কথামত তাঁকে রাজস্ব দেওয়া শুরু করলো। নিজেকে সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করার পর তিতু অনুভব করেন তারও একটি দুর্গ থাকা দরকার। সেই অনুসারে হায়দারপুরের পার্শ্ববর্তী নারিকেলবেড়ে গ্রামে গড়ে তোলা হয় অভিনব এক বাঁশের কেল্লা।

তিতুর দুর্গটি এমনিতে বাঁশের তৈরি হলেও তা বেশ শক্ত-পোক্ত ছিল। দুর্গটিকে ভাগ করা হয়েছিল বেশ কয়েকটি প্রকোষ্ঠে। এইসব প্রকোষ্ঠের কোনোটিতে খাদ্যদ্রব্য, কোনটিতে অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি রাখা হলো। উল্লেখ্য বাঁশের কেল্লা রচনা থেকে শুরু করে নিজেকে সম্রাট হিসাবে ঘোষণা দেওয়া; তিতুর এই যে কার্যক্রম তাতে বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন মিস্কিন নামের একজন ফকির। তিনি সহসা কোথা থেকে আবির্ভূত হন এবং তিতুর ধর্মগুরু হিসাবে নিজেকে মেলে ধরেন। নানাবিধ অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা এক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। জনগণ সহজেই তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর কথার অনুসারী হয়ে ওঠে।

রাজসিংহাসনে তিতু যখন বেশ জমিয়ে বসেছেন বলে মনে হচ্ছিলো তখনই তাঁর বিরুদ্ধে যাত্রা শুরু করলেন মি. আলেকজান্ডার। ১৮৩১ সনের নভেম্বর মাসের ১৮ তারিখ নাগাদ তিনি সদলবলে বাদুড়িয়ায় এসে পৌঁছালেন। এখানে তিনি সাময়িকভাবে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তিতুর বিষয়ে খবরাখবর নেওয়ার জন্য সচেষ্ট হলেন। সেই উদ্দেশ্যে দুই জন লোককে প্রেরণ করা হল নারকেলবেড়িয়ার দিকে। এই দুই জন লোক খোঁজখবর নিতে নিতে একটা সময়ে একেবারে তিতুর আস্তানার নিকট গিয়ে উপনীত হয়। এতে খবর চলে যায় তিতুর কাছে। তিতু তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দেন ওই দুইজনকে আটক করার জন্য। তাঁর নির্দেশ মতো দ্রুত একজনকে আটক করা হয়, অন্য জন কোনোক্রমে পালিয়ে যায়। যাকে আটক করা হয়েছিল তাকে দ্রুত মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া হলো। লোকটির মৃত্যুর খবর শিবিরে পৌঁছালে আলেকজান্ডার সাহেব আর অপেক্ষা না করে সকলকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ মতো সরকার পক্ষের লোকেরা সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে যাত্রা শুরু করে ভোর ভোর পৌঁছে যায় গন্তব্যস্থলে।

আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে কোম্পানির লোকজন যখন নারকেলবেড়িয়ায় পৌঁছে গেছে তখন পর্যন্ত তিতু বা তাঁর লোকজন পরিস্থিতির গুরুত্ব ঠিক মতো অনুধাবন করতে পারেননি। তবে অনতিবিলম্বে তাদের ঘুম ভাঙে। কামান-গোলা, লোক-লস্কর এসবের বহর দেখে রীতিমতো ঘাবড়ে যায় তারা। তবে ভয়ে পেলেও ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা তখনও তাদের হয়নি। তিতু তাঁর অসামান্য সম্মোহিনী বাক্যের দ্বারা অনুচরদের মনে সাহস সঞ্চার করে যাচ্ছিলেন। ঐশ্লামিক আদর্শকে বিশেষ করে সামনে তুলে ধরছিলেন তিনি। ইমানদারের পক্ষে আলাদা করে কিছু হারানোর নেই। লড়াই করে বেঁচে থাকলে দুনিয়ার বাদশাহি, আর মারা গেলে শহীদের মর্যাদা লাভ অর্থাৎ জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাওয়া। তাঁর এমন উৎসাহবাক্যে অনুপ্রাণিত হয় অনেকেই এবং

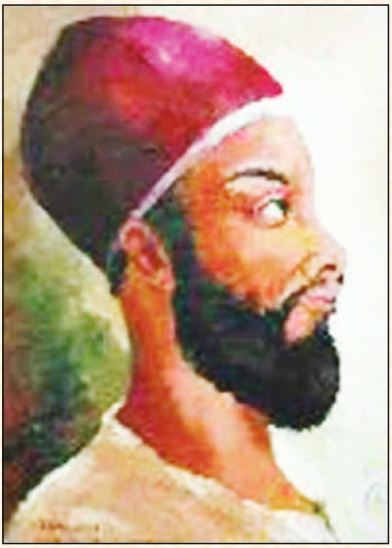

সম্মুখ যুদ্ধের জন্য দেহ মনে প্রস্তুত হয়ে নেয়। উল্লেখ্য দেহ মনে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হলেও এইসময় যুদ্ধ করার মতো অস্ত্রশস্ত্র কিন্তু তাদের হাতে বিশেষ কিছু ছিলো না। অস্ত্র বলতে সেই সনাতন ভাঙা ইট, বেল, তীর ধনুক, বল্লম এসব। কারও কারও হাত হয়তো ঝলসে উঠছে তরবারি। আধুনিক ধরনের কামানের সাপেক্ষে যা নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়।

বিরুদ্ধপক্ষের এই অস্ত্রশস্ত্রের তুচ্ছতার কথা যথাসময়ে আঁচ করে নিয়েছিলেন আলেকজান্ডার সাহেব। তাই তিনি চাইছিলেন সরাসরি যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে। কেন না এতে একপক্ষের প্রভূত ক্ষতি হবে। আলেকজান্ডারের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল তিতু নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করুক। কিন্তু তিতু তাতে কিছুতেই সম্মত নয়। এতে পরিস্থিতির অবনতি হয়। একটা সময়ের পর আলেকজান্ডার আনুষ্ঠানিক যুদ্ধের ঘোষণা দেন। তাঁর নির্দেশ মতো কোম্পানির সেনাদের পক্ষ থেকে প্রথমেই কামানের কয়েকটি ফাঁকা আওয়াজ করা হয়। এই আওয়াজের প্রত্যুত্তর দিতে তিতুর লোকেরা ঈশ্বরের নামে ধ্বনি দিতে বাঁশের কেল্লা থেকে বেরিয়ে আসে এবং কোম্পানির সেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন দুই পক্ষের মধ্যে একরকম মল্ল যুদ্ধ শুরু হয়। সংখ্যাধিক্যের কারণে এই যুদ্ধে তিতু পক্ষ সুবিধা পেতে থাকে। তুলনায় কোম্পানির অধিক সৈন্য হতাহত হয়। অবস্থা পর্যালোচনা করে আলেকজান্ডারের মনে হয় এরপর আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না; সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। তাই তিনি

আর কালবিলম্ব না করে বাঁশের কেল্লা লক্ষ করে কামান দাগার নির্দেশ দেন।

তিতুর বাঁশের কেল্লা এমনিতে বেশ শক্তপোক্ত হলেও কামানের গোলার বিপরীতে শেষাবধি টিকে থাকার মতো কোনো বিষয় ছিল না। তাই গোলাবর্ষণ শুরু হতেই কেল্লার ভিতরের লোকদের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে। কিন্তু তিতু তখনও তাদের মনে অভয় যুগিয়ে যাচ্ছিলেন, তাদের মনোবল দৃঢ় করছিলেন। এদিকে যুদ্ধ তখন এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিলো যে নিছক মনোবল দিয়ে বিশেষ কিছু করার ছিলো না। তিতু নিজেও সেটা ভালো করে বুঝতে পারছিলেন। তবু তিনি শেষ পর্যন্ত সচেষ্ট থাকার চেষ্টা করেন। যথাসম্ভব প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে ব্যর্থ হয় প্রতিরোধের যাবতীয় প্রয়াস। বাঁশের কেল্লা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হতে হয় অধিকাংশ জনকে। তখন আর লড়াই করার মতো কোনো উপায় নেই। লোকজনকে তাই কোনোক্রমে জীবন বাঁচানোর জন্য উদ্যোগী হতে দেখা যায়। কেউ কেউ নিকটস্থ গাছে চড়ে বসে। যারা গাছে ওঠে যায় বা ওঠার চেষ্টা করে তাদের দিকে বন্দুকের গুলি ছোড়া হলো। সব মিলিয়ে যথাসময়ে মৃত্যু মিছিলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠলো তিতু ও তাঁর সাথীরা।

১৯ নভেম্বর অপরাহ্নে লড়াই যখন শেষ হয় তখন দেখা যায় বাঁশের কেল্লার সামনে প্রচুর লাশ পড়ে রয়েছে। এইসব লাশের মধ্যে থেকে তিতুর লাশটি খুঁজে বার করা হয়। তারপর আলোচনা চলে মৃত তিতুকে নিয়ে কী করা হবে। আলেকজান্ডারের সিদ্ধান্তই এক্ষেত্রে কার্যকর হয়। অপরাপর মৃতদেহের সঙ্গে তিতুর দেহকেও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য তিতুর ভক্তরা তাঁর লাশকে কবরস্থ করে ওই কবরকে ঘিরে সমবেত হতে না পারে; ভবিষ্যতে যাতে নতুন করে কোনওরকম আন্দোলন দানা না বাধে। মৃতদেহগুলিকে পুড়িয়ে দেওয়ার পর বন্দীদের চালান করে দেওয়া হয় বিচারের উদ্দেশ্যে।

বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে হতে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়। রায় ঘোষিত হয় যথাসময়ে। বিচারকের রায় অনুসারে সেনাপতি গোলাম মাসুমের মৃত্যুদণ্ড ও ১৩৬ জন আসামীর বিভিন্ন মেয়াদের কারাবাস হয়; উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে কয়েকজন বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত গোলাম মাসুম সম্পর্কে আলাদা করে বলা হয়, তার মৃত্যুদণ্ড এমনভাবে কার্যকর করতে হবে যাতে মানুষ উপযুক্ত শিক্ষা পেতে পারে এবং সেইসূত্রে ভবিষ্যতে এমন কাজ করতে প্ররোচিত না হয়। ঠিক হয় নারকেলবেড়িয়া বা সন্নিহিত অঞ্চলে দিবালোকে জনসমক্ষে মাসুমকে ফাঁসি দেওয়া হবে। সেই অনুসারে গোলাম মাসুমের মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়। অতঃপর আপাত পরিসমাপ্ত হয় তিতু ও তাঁর বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত।

তিতু ও তাঁর বিদ্রোহ প্রসঙ্গে আমাদের কথা

তিতু ও তাঁর বিদ্রোহ নিয়ে সেই প্রথম দিন থেকে অদ্যাবধি নানা জন নানা কথা বলেছেন। তাঁদের কথায় বরাবর একটা সুরে অনুরণন সুস্পষ্ট হয়েছে। সংগ্রামী নায়ক হিসেবে তিতুর ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রতি সশ্রদ্ধ হয়েছেন প্রায় সকলেই। প্রখ্যাত উনিশ শতক গবেষক অধ্যাপক স্বপন বসু তিতু সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন—"তিতুমির তাঁর আক্রমণ শুধুমাত্র জমিদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গ্রাম বাংলার আর এক বিভীষিকা নীলকরদের বিরুদ্ধেও তাকে ছড়িয়ে দেন। উনিশ শতকের প্রথম থেকেই এদেশে 'নীল বাঁদরের' অত্যাচার বাড়তে থাকে। একবার দাদন নিলে কোন কৃষকের পক্ষে নীলকরদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া হয়ে উঠতো দায়। অঞ্চলে নীলকররা বছরের পর বছর নিরীহ কৃষকদের ওপর যে অত্যাচার চালাচ্ছিল, তারই প্রতিবিধানে এগিয়ে এলেন কৃষক নেতা তিতুমির। দাদন গ্রহণের কাগজপত্র নষ্ট করে কৃষক সমাজকে বাঁচার পথ দেখানোর জন্য একের পর এক নীলকুঠি আক্রান্ত হতে থাকে। ...তিতুমির যে সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তা বিদ্রোহের সূত্রপাত হলেও বিদ্রোহ যতই অগ্রসহ হয়েছে ধর্মীয় আওতা থেকে

বেরিয়ে এসে তা ব্রিটিশ শাসক, স্থানীয় নীলকর ও জমিদারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে। তিতুমিরের অনুগতদের সবাই ছিলেন ২৪ পরগনা ও নদীয়ার দরিদ্র কৃষক—দীর্ঘদিন ধরে জমিদার ও নীলকরদের হাতে যে দুঃসহ অত্যাচার তাঁরা সহ্য করেছিলেন—তাঁদের সেই অবরুদ্ধ ক্ষোভকে কাজে লাগান তিতুমির। ...তিতুমিরের সবচেয়ে কৃতিত্ব বোধহয় এটাই যে, তিনি বাংলার অশিক্ষিত নিপীড়িত কৃষকসমাজকে জমিদার-নীলকরদের পৃষ্ঠপোষক ইংরেজরাজের সঠিক চরিত্রটি বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলার বুদ্ধিজীবীরা যখন গদগদ কণ্ঠে এদেশে ব্রিটিশের আগমনকে বিধাতার আশীর্বাদ হিসাবে গণ্য করে শ্বেত-প্রভুদের পদলেহনে ব্যস্ত, ঠিক সেইসময়ই তিতুমিরের ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।" (সম্পাদকীয় সংযোজন, তিতুমির—বিহারীলাল সরকার) অধ্যাপক সুপ্রকাশ রায়ও প্রায় একই ভাষায় অভিষিক্ত করেছেন তিতুমিরকে—"কিন্তু ইহাও সত্য যে, পরাধীন ভারতে তিতুমির প্রমুখ ওয়াহাবি বিদ্রোহের নায়কগণই সর্বপ্রথম সচেতনভাবে ইংরেজ-শক্তির উচ্ছেদ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ধ্বনি তুলিয়াছিলেন এবং সেই ধ্বনিকে কার্যকরী রূপ প্রদানের জন্য নির্ভয়ে জীবন আহুতি দিয়েছিলেন।...সাম্প্রদায়িক ধ্বনি সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিম্নস্তরের জনগণের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছিল। বিদেশি ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ করিয়া ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার আদর্শই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ভারতব্যাপী ওয়াহাবি বিদ্রোহের ও তিতুমিরের নেতৃত্বে পরিচালিত বারাসাত-বিদ্রোহের শ্রেষ্ঠ ও অবিস্মরণীয় দান। (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম)

তিতুমির ও তাঁর বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বদের এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হতে পারেননি কেউ কেউ। তিতুর প্রথম জীবনীকার বিহারীলাল সরকার যেমন। তিতুমির গ্রন্থে তিনি একাধারে তিতুর

প্রশংসা ও নিন্দা করেছেন। প্রতাপরুদ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো আরও দুই একজন উত্তরকালে তাঁর সুরে সুর মিলিয়েছেন। তবে তাঁদের এই চেষ্টা শেষপর্যন্ত ধোপে টেকেনি। বিহারীলাল সরকার তিতুকে অভিযুক্ত করেছেন মুখ্যত দুটি দিক থেকে। তাঁর মতে, প্রথমত, তিতু এমন কাজ করেছিলেন যা থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয়েছিল; দ্বিতীয়ত, তিতু ছিলেন অপরিণামদর্শী। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে তিনি নিছক এক উৎপাত শুরু করেছিলেন এবং অত্যধিক রক্তপাতের কারণ হয়েছিলেন। আমাদের মনে হয় তিতু সম্পর্কিত এমন মূল্যায়ন অযথার্থ; অন্য অর্থে ঐতিহাসিক বাস্তবতা নিরপেক্ষ বিষয়। তিতুর আন্দোলন কোনো অবস্থাতেই সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির কারণ হয়নি। তিনি মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে একসঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন। তাঁর আন্দোলনের অঙ্গনে সাম্প্রদায়িকতার কোনোরকম ছায়াপাত ছিল না। কিছু ঘটনা প্রসঙ্গত ঘটেছিল যার থেকে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে নারিকেলবেড়িয়ার বিদ্রোহে সাম্প্রদায়িকতার রঙ লেগেছিল। কিন্তু স্বরূপত তা নয়। অমুসলিম জমিদার কর্তৃক মুসলিম সমাজের ভাবাবেগকে পদদলিত করা হলে তিতু তাঁর প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন মাত্র। না হলে নিজে তিনি আগ বাড়িয়ে এমন কিছু করেননি যাকে সাম্প্রদায়িক পদক্ষেপ বলা যায়। এই প্রসঙ্গে কলভিন এর রিপোর্ট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—"এটা সঠিক যে আশেপাশের গ্রাম থেকে অনেক অপরিচিত লোক জমিদারের গ্রামে এসেছিল। এরা সকলেই ছিল তিতুমিরের অনুসারী যদিও এই এলাকায় তিতুমিরের অনুসারীদের সম্পর্কে কোনো আইনবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ পাওয়া যায়নি। প্রকৃতপক্ষে মহরম উপলক্ষ্যে, এই গ্রামে ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এদের কেউ ধারণা করতে পারেনি যে এই ভোজ খাওয়া উপলক্ষ্য নিয়ে তাদেরকে সন্দেহ করা হবে অথবা অভিযুক্ত করা হবে।" যে ঘটনার প্রেক্ষিতে তিতু ও তাঁর অনুসারীরা কমবেশি সাম্প্রদায়িকতার জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন সে সম্পর্কে কলভিন মূল্যায়ন এইরকম। বলা যায় তিতু, এক্ষেত্রে

পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন। যদি পরিস্থিতি সব কিছু অনুকূলে থাকতো, যদি জমিদার মহাশয় অন্যায়ভাবে তিতু ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে চড়াও না হতেন; যদি ইংরেজ প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপযুক্ত সহায়তা দেওয়া হতো তবে সম্পূর্ণ অন্যরকম করে লেখা হতে পারতো তিতুর ইতিহাস। সেক্ষেত্রে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম শহীদ ও কৃষক আন্দোলনের মহানায়ক তিতুমিরের ব্যক্তি চরিত্রে বা তাঁর আন্দোলনের শরীরে কোনোরকম কালোদাগ থাকতো না। কলভিনের অভিমত এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করে—"তিতুমিরের অনুসারীগণ শান্তিপ্রিয় ও অহিংস চরিত্রের অধিকারী ছিল। এই বিষয়টি দারোগা কোর্টে গোপন রাখে। এর ফলে ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট তাদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিতে পারেন নি। নতুন সম্প্রদায়ের অনুসারীগণ তখনও পর্যন্ত জেলার শাসনের বিরুদ্ধে তেমন কিছু করেননি বেসামরিক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো কোনো ঘটনায় জড়িত হয়নি।...প্রতিটি তদন্তের পর দারোগা ইচ্ছাকৃতভাবে নীরব থাকে এবং একটি পক্ষের সাথে যুক্ত থেকে কাজ করে। তিতুমিরের অনুসারীদের আপিল সত্ত্বেও অফিস তা খারিজ করে দেয়। আমি শুধু দুঃখ প্রকাশ করে বলছি যে, আমার কাছে যদি ক্ষমতা থাকত তা হলে দারোগাকে বড়ো ধরনের শাস্তি প্রদান করার বিষয়ে বিবেচনা করতাম।"

তিতু অপরিণামদর্শী, এমন অভিযোগ অবশ্যই একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার নয়। অতি সীমিত শক্তি নিয়ে তিনি যেভাবে বিরাট ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন তা থেকে তাঁকে একঅর্থে হয়তো অপরিণামদর্শী বলা যেতে পারে। লাঠি, ইট, বেল, তীর ধনুক এসব দিয়ে আর যাই হোক গোলা বারুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না, এটা খুব সম্ভব তিতু সেভাবে আন্দাজ করে উঠতে পারেননি। ইংরেজ রাজশক্তির শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ কোনো ধারণা ছিল কি না তা নিয়েও গভীর সন্দেহ করা চলে। তিতু যদি ইংরেজ

রাজশক্তিকে তাঁর শত্রুর তালিকাভুক্ত না করে কেবল জমিদার এবং নীলকরদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতেন তবে তা অনেক স্থায়ী ও কার্যকর হতে পারতো। যদি রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতেই হতো তবে তার জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করা যেতো। সম্মুখ সমরে না নেমে যদি গেরিলা পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হতো তবে তিতুর লড়াই এর ফলাফল কিছুটা অন্যরকম হতে পারতো। যে অঞ্চলে তিতুর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছিল সে অঞ্চল সেদিন খুবই দুর্গম ছিল। শহর থেকে ওখানে পৌঁছানো ছিল রীতিমতো কষ্টকর। এই অবস্থায় যদি গেরিলা পদ্ধতিতে লড়াই করা হতো তবে তিতুকে এঁটে ওঠা অন্যদের পক্ষে মোটেই সহজ হতো না। বিশেষত বিস্তীর্ণ এলাকার বিরাট কৃষক সমাজ যেখানে তাঁর পক্ষে ছিল। উত্তরকালে এমন প্রেক্ষিতে গেরিলা পদ্ধতি অবলম্বন করে বিশেষ সাফল্য পেয়েছিলেন তেভাগা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। তিতু এমন সব কৌশলের আশ্রয় না নিয়ে সরাসরি সংঘাতের পথে পা রেখেছিলেন। এটা তাঁর কিছুটা ভুল পদক্ষেপ ছিল বলেই মনে হয়।

অর্থাৎ কৃষক আন্দোলনের নেতা হিসাবে তিতুর মধ্যে অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। তবু এটা অনস্বীকার্য যে, এইসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিতু শেষাবধি যা করতে পেরেছিলেন তার তুলনা তাঁর সমকালে মোটেই সুলভ ছিল না। বরং নিজস্বক্ষেত্রে এক হিসাবে তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তিতু, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন একজন স্বাধীন সার্বভৌম সম্রাট হিসাবে। এমনভাবে ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে দেশীয় মানুষের স্বাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস অন্যত্র সেভাবে দেখা যায় না। শাসক হিসাবে তিতু সেভাবে নিজেকে মেলে ধরার কোনো সুযোগ পাননি। সামান্য সময় মাত্র তিনি শাসকের ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পেরেছিলেন। এই সামান্য সময়ের অবসরে তাঁর দ্বারা শাসক হিসাবে যে কৃত্যাদির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে তা বেশ ইতিবাচক। এমনিতে সাম্প্রদায়িকতা বলতে আমরা যা বুঝি তিতু তার থেকে বহু ঊর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত

করেছিলেন। বাহ্যত অতি নিষ্ঠাবান মুসলমান হলেও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অমুসলিম। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বোঝা যায় স্বধর্মে নিষ্ঠ থেকেও তিতু তাঁর চরিত্রে ও ক্রিয়াকলাপে এমন কিছু মাত্র যোগ করতে পেরেছিলেন যা থেকে অমুসলিমরাও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো এবং তাঁকে অনুসরণ করেছিলো নিষ্ঠার সঙ্গে। এই বিষয়টি সমকালে মোটেই সহজসাধ্য ছিলো না। তখন এমন একটা সময় চলছিলো যখন বাঙালির জাতীয় জীবনের অঙ্গনে সাম্প্রদায়িকতার ছায়া ক্রম প্রসারিত হচ্ছিলো। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হিন্দু আরও বেশি করে হিন্দু ও মুসলিমরা আরও বেশি করে মুসলিম হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিলো। এমন সংকটের দিনে তিতু নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছিলেন অনেকটা অন্য রকম করে। মনে রাখতে হবে, যাকে আজ আমরা ধর্ম নিরপেক্ষ উদার অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব বলে মনে করি তার ধারণা সেদিন সুস্পষ্ট ছিল না। তখন স্বধর্মে সনিষ্ঠ থেকে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকাকে ধর্মনিরপেক্ষতার মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা হতো। তিতু সেই মাপকাঠিতেই নিজেকে মাপতে চেয়েছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন। অসাম্প্রদায়িক মন ও মননে ঋদ্ধ এক ভাবমূর্তি হিসাবে তিতুমিরের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা অনস্বীকার্য।

যে কোনো আন্দোলন বা লড়াই এর ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপিত হয় উত্তরকালের সাপেক্ষে। উত্তরকাল ওই আন্দোলনকে কি চোখে দেখেছে, তার দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছে, এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেদিক থেকে দেখলে তিতু ও তাঁর আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য অপরিসীম। তিতুর সংগ্রাম কৃষিজীবী মানুষের সংগ্রাম; অন্য অর্থে শোষিত নির্যাতিত ও সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত মানুষের মুক্তির সংগ্রাম। এই দুই দিকের কোনো দিক থেকেই তিতু ও তাঁর অনুসারীদের সংগ্রাম ব্যর্থ হয়নি। কৃষকদের অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে আজও আন্দোলন হচ্ছে, সংগ্রাম চলছে, সেদিনও তা হয়েছিল। এখন অনেকাংশে কৃষক শ্রেণির অধিকার সুরক্ষিত হয়েছে। রাষ্ট্রের

পক্ষ থেকে কৃষকদের সুখ দুখের দিকে আলাদা করে নজর দেওয়া হচ্ছে। কৃষক সংঘ তৈরি হয়েছে। কৃষকরা এখন নিজেদের ভাগ্য কমবেশি নিজেরাই গড়ে নিতে সক্ষম। আজকের ভারতের কৃষক সমাজের এই যে সাফল্য তার নেপথ্যে তিতুর পরোক্ষ ভূমিকা অনস্বীকার্য। শুধু তাই নয়, তিতু যাদের হয়ে, যাদের নিয়ে শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তারা সকলেই প্রায় নিম্নবিত্তের মানুষ। তাদের হিন্দু বা মুসলমান এই পরিচয়ই বড়ো নয়। তাদের এক ও অদ্বিতীয় পরিচয় তারা লাঞ্ছিত নির্যাতিতদের একজন। এমন লাঞ্ছিত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন তিতু এবং আজও সে চেষ্টা অব্যাহত আছে। সেদিক থেকে দেখলে তিতু ও তাঁর সংগ্রাম চির জাজ্জ্বল্যমান অগ্নিশিখার অংশবিশেষ। তিতুর এই ঐতিহাসিক ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গিয়ে গবেষক কুমারেশ দাশ যথার্থ বলেছেন— ''তিতুমিরের মৃত্যুর পর পৌনে দু'শো বছর পর হল। একুশ শতকের গোড়ায় এসে আর এক বিদ্রোহ। অস্তিত্বের লড়াই। 'মানুষ' এর বেঁচে থাকার লড়াই। বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে কৃষি ও জমি রক্ষার লড়াই। তফাৎ একটাই—তিতুমীর ও অন্ত্যজদের লড়াইটা ছিল কোম্পানি শাসিত পরাধীন ভারতের বঞ্চিতদের সমর্থনে; উৎপীড়িতদের সমর্থনে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁরা। আর একুশ শতকের দোরগোড়ায় অন্ত্যজ ভূমিজীবীদের লড়াই আর্য-শাসিত ক্ষমতা হস্তান্তরিত ভারতে। লড়াইটা সাম্রাজ্যবাদ পুষ্ট উন্নততর শোষকদের বিরুদ্ধে কৃষক ও অন্ত্যজ মানুষদের। ...সেদিনও রাষ্ট্র বন্দুকের নল তুলে বিদ্রোহকে ধূলিসাৎ করেছে। একশো পঁচাত্তর বছর পরেও রাষ্ট্র অত্যাধুনিক উন্নততর সাংস্কৃতিক বাহিনীসহ বন্দুকের নল দিয়ে অন্ত্যজ চাষিদের ধূলিসাৎ করতে চাইছে।'' (তিতুমির বিদ্রোহ ও বিজয় বাঁশের কেল্লা) চেষ্টার খামতি ছিল না ওদের দিক থেকে। কিন্তু এবার ঘটনাচক্রে ফলাফল হলো ভিন্ন। অত্যাচারী রাষ্ট্রশক্তির তত্ত্বাবধানে ধূলিসাৎ করে দেওয়া গেল না কৃষক ও অন্ত্যজ মানুষের একান্ত চাওয়া পাওয়াকে। পরিবর্তে রচিত হল অন্য ইতিহাস। পরাভূত হতে হলো প্রবল

প্রতাপান্বিত বিরুদ্ধ পক্ষকে। তাদের এই পরাভব নিঃসন্দেহে ইতিহাসের পটভূমিতে মানবতাবাদী সংগ্রামী মানুষের পবিত্রতম অর্জন। বলাবাহুল্য এ অর্জনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেকটা সময়, পাড়ি দিতে হয়েছে দীর্ঘ পথ; আর সে পথচলার শুভ সূচনা হয়েছিল তিতুমির ও তাঁর সংগ্রামকে ঘিরে। আজকের সাফল্য আসলে স্বাধিকারের প্রশ্নে তিতুমির ও তার সঙ্গীদের সেদিনের সেই লড়াই এর অনিবার্য অভিঘাত।

লেখক পরিচিতি
সাইফুল্লা
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

Helpline

1800 120 2130

Visit Us at

http://www.wbmdfc.org/

WEST BENGAL MINORITIES DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION

(A Statutory Corporation under MA & ME Department, Govt. of West Bengal)

"AMBER" DD-27/E, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-700064

Printed at : Digital Graphics, 9830829976